Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 267 – 275
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

জাতীয়তাবাদের আলোকে 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'

শঙ্খ দত্ত
গবেষক বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : shankhadutta00@gmail.com

Keyword
গোঁড়ামি, ধর্মসংস্কার, ইংরেজবিদ্বেষ, সর্বধর্মসমন্বয়, মানবতাবাদ, প্রেম, সতীত্ব, স্বদেশী আন্দোলন।

Abstract
'গোরা' এবং 'ঘরে-বাইরে' উভয় উপন্যাসই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার পরিচায়ক। বঙ্গীয় রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে গোঁড়া হিন্দুর সাকার উপাসনা ও যাবতীয় আচার-সর্বস্বতার বিপ্রতীপে তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের নিরাকার একেশ্বরবাদী সাধনাকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে 'গোরা' উপন্যাসটি উভয় গোঁড়ামির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সর্বধর্মসমন্বয় ও মানবতাবাদের জয়গান করে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশীয়ানার নামে দরিদ্র দেশবাসীর উপর জুলুম দেশপ্রেম প্রদর্শনের ঠিক পন্থা কিনা- এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গোরা ও নিখিলেশ উভয়ই দেশ বলতে বুঝেছে দেশের মানুষ। হিন্দু নিরক্ষর, 'ছোট জাত' এর মধ্যে আচারসর্বস্বতা ও কুসংস্কারের কদর্য প্রভাব যেমন সকল আচারে বিশ্বাসী গোরার মনেও দ্বিধার জন্ম দিয়েছে একইভাবে নিখিলেশও হুজুগে মেতে দেশপ্রেমের নামে দরিদ্র দেশবাসীর সস্তা বিলাতি পণ্য কেনার অধিকার খর্ব করতে পারেনি। উভয় উপন্যাসেই তত্ত্বভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে প্রেম-মনস্তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ দুটি উপন্যাসেই খুঁজেছেন দেশের আত্মাকে- ধর্ম ও স্বাধীনতা দুটি প্রশ্নেই শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনা।

Discussion

এক

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার সম্যক পরিচয় পেতে 'গোরা' অবশ্যপাঠ্য একথা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন পরিবেশিত হয়েছে ধর্মীয় ব্যবধানকে উপেক্ষা করে গোরা- সুচরিতা ও বিনয়- ললিতার নিঃস্বার্থ প্রেম কাহিনী অন্যদিকে তেমনই রেনেসাঁ পরবর্তী বাংলা তথা ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রকৃত পথ বেছে নেওয়ার দ্বন্দ্ব- সনাতন হিন্দু ধর্ম অথবা পৌত্তলিকতাহীন আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম।

উপন্যাসের গোড়া থেকেই প্রেম ও তত্ত্বালোচনা হাত ধরাধরি করে চলেছে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনায় সনাতন হিন্দু ধর্মের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। আধ্যাত্মিকতা ও

দর্শনকে ছাপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে তার বিভিন্ন অযৌক্তিক, অমানবিক, পশ্চাদমুখী আচার-আচরণগুলি। এতে যে কোনো ধর্মই কলুষিত হতে বাধ্য। আঠেরো শতকের শেষ পাদে এই অন্ধকার যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামমোহন রায়।

> "রামমোহন থেকে শুরু হয়েছে যুক্তি অনুমোদিত ধর্ম ব্যাখ্যার প্রয়াস।"[১]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন ও তাঁর অনুরাগীরা একদিকে যেমন প্রচলিত হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে চেয়েও স্ববিরোধিতার কারণে ব্যর্থ হচ্ছেন, অন্যদিকে মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণে কিছুটা সফলও হচ্ছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে সনাতনপন্থীরা আত্মসংস্কারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তাদের অচলায়তনকেই আঁকড়ে ধরে আছেন।[২] ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়ে পৌত্তলিকতাহীন ও একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবত এটাই অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু ব্রাহ্মরা গোড়া থেকেই আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার চোরা অহংকারে ডুবে থেকে ভারতের মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, বিশেষত মুসলমান জনসমাজের সঙ্গে তাদের একটা দূরত্ব হয়।[৩]

হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের এই দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে 'গোরা' উপন্যাসে। তাই গোরা বিনয়কে বলে,

> "অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দা করছিল তাতে এই বোঝা যায় যে, লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক আছে।"[৪]

স্পষ্টতই সনাতন হিন্দু ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে বিদেশী খ্রিস্ট ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এই বীতরাগ কেবল গোরা নয় সকল গোঁড়া হিন্দুরই মনোভাব ছিলো বলা যেতে পারে।

আলোচ্য উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশী প্রতিরোধের অতিরঞ্জিত কাহিনী রচনা না করে বরং ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচার ও তার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা, ধর্মীয় আচারসর্বস্বতার ফাঁসে রুদ্ধশ্বাস মানবিকতাকে তুলে ধরেছেন নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে খুঁজতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের আত্মাকে, স্বদেশকে জানতে চেয়েছেন ভেতর থেকে।

এই প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন মূলত তিন শ্রেণির চরিত্র। একটি শ্রেণিতে তিনি দেখিয়েছেন তৎকালীন ইংরেজিনবিশ ও ইংরেজের প্রশংসালোলুপ কিছু দিশি সাহেব চরিত্র যারা সনাতন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছেন তার আচার সর্বস্বতার প্রতি লজ্জাবোধে কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি এদের চরম তাচ্ছিল্য। ব্রাহ্ম হারানবাবু ও গোরার ত্রিবেণী যাত্রা কালে স্টিমারের সেই দিশি সাহেব ভদ্রলোক এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় জনের স্বদেশের অসহায় মানুষগুলির প্রতি বিদেশিদের অনুকরণে নির্মম তামাশাই গোরাকে ব্যথিত করেছিল সবচেয়ে বেশি। তাই তাকে সে সরাসরি তিরস্কার করে। সেই দিশি সাহেবটি নিজেকে সাধারণ ভারতীয়দের থেকে পৃথক দেখানোর জন্য তৎকালীন হিন্দুর অভক্ষ্য মুরগির মাংস ফরমাশ করে কিন্তু চন্দননগরে স্টিমারের সাহেব গোরার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ যেন এই ইঙ্গিতই দিলেন যে ইংরেজের অনুকরণে দিশি সাহেবের দল কেবল তাদের বাইরের খোলসটুকু বদলেছেন কিন্তু নকলনবিশি করে ইউরোপীয় সভ্যতার আলোয় অনেকেই তাদের হৃদয়কে আলোকিত করতে পারেননি।

হিন্দুদের মত ব্রাহ্মদের কিন্তু আচার বিচারের এত কঠোরতা ছিল না। গোঁড়া হিন্দুরা খ্রিস্ট ধর্মকে ম্লেচ্ছ জ্ঞানে যখন ইংরেজের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল তখন ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ইংরেজের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার ত্রুটি করেনি কারণ তাদের চোখে ইউরোপীয় সভ্যতা ছিল উন্নত ও অতুলনীয়। উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের এহেন মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে কেবল হারানবাবু নয়, প্রগতিশীলতার মুখোশধারী বরদাসুন্দরীরও লক্ষ্য ছিল ইংরেজের প্রশংসা আদায় করে নেওয়া। তাই ব্রাউন্‌লো সাহেবের স্ত্রীর পরামর্শে মেলায় আগত সস্ত্রীক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সামনে নিজ কন্যাদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। গোরা ও হারানবাবুর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালির ইংরেজের সঙ্গে মেশার অযোগ্যতা নিয়ে হারানবাবুর আক্ষেপ

কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন্‌লো সাহেবের সামনে পরাধীন দেশের নাগরিক হারানবাবুর ইংরেজস্তুতি ব্রাহ্ম ও ইংরেজের সুসম্পর্কের কথাই প্রকাশ করে।

এবার উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে আমরা অপর একটি শ্রেণিকে লক্ষ্য করতে পারি যারা প্রত্যেকেই গোঁড়া হিন্দু। এই দলে আছেন গোরার পিতা কৃষ্ণদয়াল, সুচরিতার মাসি হরিমোহিনী এবং হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠায় তার অন্যতম সহায়ক অবিনাশ।

হিন্দু কলেজের জনপ্রিয়তম শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে তার যে সকল হিন্দু ছাত্ররা এককালে সনাতন হিন্দুত্বের সকল চিহ্ন নিজেদের শরীর- মন থেকে মুছে ফেলতে সাগ্রহী ছিলেন তাদেরই কেউ কেউ পরবর্তী কালে তারুণ্যের উচ্ছাস স্তিমিত হওয়ার পর প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু সমাজেই প্রত্যাবর্তন করেন। কৃষ্ণদয়াল চরিত্রটিও তাদের ছায়ায় নির্মিত। যুবা বয়সে কর্মক্ষেত্রে তিনি আদর্শ হিন্দুর সকল অভক্ষ্যই আহার করেছেন, যে কোন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন তার কাছে পরম তাচ্ছিল্যের পাত্র কিন্তু বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কেবল হিন্দুত্বের আশ্রয়ে ফিরে এসেছেন তাই নয়, স্নেহ, ভালোবাসা, প্রেম- প্রীতি ইত্যাদি মানবিক বন্ধনগুলিও তুচ্ছ করে তিনি নিজের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মীয় গোঁড়ামিগুলিই যেন মানবতার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রেখে চলে। সকল গোঁড়ামিরই স্বরূপ এক- হিন্দু–ব্রাহ্ম নির্বিশেষে। তাই কৃষ্ণদয়ালের এই আচারসর্বস্ব জীবনকে যেমন রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছেন তেমনই ব্রাহ্ম ধর্ম উদারতার কথা বললেও হারানবাবুর গোঁড়া হিন্দু গোরার প্রতি বিদ্বেষ কিংবা হরিমোহিনীর স্বাধীন ধর্মাচরণের প্রতি 'প্রগতিশীল' বরদাসুন্দরীর আক্রোশ আসলে গোঁড়ামিরই নামান্তর- সেকথাই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন উপন্যাসে।

আচারসর্বস্ব ধর্মপালনে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয়না তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল হরিমোহিনী। আপনজনের দ্বারা প্রতারিত হয়ে বিধবা হরিমোহিনী নানা তীর্থ ভ্রমণের পর অবশেষে আশ্রয় নিলেন পরেশবাবুর কাছে। সেখানে ব্রাহ্ম বরদাসুন্দরীর ভয়ে রা না কাড়লেও সুচরিতার সঙ্গে পৃথক বাড়িতে উঠে যাওয়ার পরই ক্রমশ তার আচরণে গোঁড়া হিঁদুয়ানি প্রকাশ পেল। উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে বোঝা যায় হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয়পক্ষেই রবীন্দ্রনাথ দুটি করে গোঁড়া চরিত্র নির্মাণ করে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। গোঁড়া হিন্দু হরিমোহিনী, গোঁড়া ব্রাহ্ম বরদাসুন্দরী, একদিকে হারানবাবু অন্যদিকে অবিনাশ।

আগেই বলা হয়েছে নবজাগরণ পরবর্তী বাংলা তথা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, আচার সর্বস্বতা এবং মানুষে মানুষে চরম ভেদাভেদই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিকে ধর্ম সংস্কারের এবং প্রয়োজনে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে বাহ্যিক প্রগতিশীলতার প্রলেপ আচ্ছাদিত খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উভয় ধর্মমতেরই গোঁড়ামি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের সকল সাধারণ মানুষ কিন্তু কেবল এই দুই ধর্মমতের কোনো একটির মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে না। প্রতিটি ধর্মই কেবল তার নিজের সমাজের প্রতিই অনুকূল। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে ধর্মের যোগ তো অচ্ছেদ্য। ধর্মকে বাদ দিলে এই দেশের আত্মার সন্ধান মিলবে না- তাই যেন রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মের থেকে বড় ধর্ম মানবধর্মের কথা যা সর্বধর্মসমন্বয়কে স্বীকৃতি দেয়, যে ধর্মের প্রতি গোঁড়ামি নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক। আনন্দময়ীর চরিত্রটিকে আমরা তাই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত করতে পারি- যে উপন্যাসে বিশ্বমানবতার কথা বলে। মানবধর্মের কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের দীক্ষা এই ধর্মে।

কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী আর পাঁচটা হিন্দু নারীর মতই হিন্দু আচারে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু স্বামীর আপত্তি ও অসহযোগিতায় একটি একটি করে সকল আচার মুক্ত হন। পরিশেষে নিঃসন্তান আনন্দময়ী সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন আইরিশ শিশু গোরাকে অপত্য স্নেহে বুকে তুলে নিলেন তখনই তাঁর গোঁড়ামির বাঁধনটি ছিঁড়ে মানবধর্মে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। অতঃপর কৃষ্ণদয়াল বদলে গেছেন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে তিনি অতীতের সকল 'পাপ'- এর প্রায়শ্চিত্ত করছেন- এই যেন তাঁর ভাব। কিন্তু আনন্দময়ী ও গোরার মাঝে ধর্মের, আচার- বিচারের যে বেড়া সেদিন ভেঙে গেছিল তা আর ফিরে আসেনি। তাই তিনি বলেন,

> "আমি যদি খৃষ্টান বলে, ছোট জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক, আমি পৃথিবীর সকল জাতের কাছেই জল খাব।"[৫]

কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ীর কথোপকথনের মধ্যে তাঁর প্রাঞ্জল, স্বতস্ফূর্ত ও মেয়েলি সংলাপে ধরা পড়েছে হিঁদুয়ানির সীমাবদ্ধতার দিকটি-

> "আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি, তা, খৃষ্টান কি মানুষ নয়? তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের, তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?"[৬]

মানবধর্মই যদি একমাত্র পালনীয় ধর্ম হয় তবে সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা জটিল সামাজিক বাধাগুলো কত সহজে অপসারিত হয় তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে আনন্দময়ীর সহজ ভাবনায়-
সুচরিতা ও গোরার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আনন্দময়ী বিনয়কে বলেন,

> "মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে- সে সময়ে কোন মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কী আসে যায় বাবা!"[৭]

কিংবা যখন তিনি বলেন,

> "বাবা ব্রাহ্মই বা কে আর হিন্দুই বা কে। মানুষের হৃদয়ে তো কোনও জাত নেই- সেইখানে ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজেও এসে মেলেন।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ এই মানবধর্মের আধারেই ভারতবর্ষকে খুঁজতে চেয়েছেন। এই ধর্মই কেবল পারে ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যকে ধরে রাখতে।

অন্যদিকে ব্রাহ্ম পরেশবাবুও যে নিজের ধর্মমতের ঊর্ধে ঊঠে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তার পেছনেও প্রচ্ছন্ন থেকেছে তাঁর মানবতা বোধ। বিনয় ও ললিতার হিন্দুমতে বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি সুচরিতাকে বলেন,

> "মানুষকেই সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে একথা কখনোই ঠিক নয়, সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে।"[৯]

এই মন্তব্য যে ব্রাহ্ম গোঁড়ামির বিপরীতে গিয়ে দুটি মানুষের প্রেমকেই অধিক মূল্য দেয় তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। আনন্দময়ীর মত পরেশবাবুরও একটা সহজ স্বাভাবিকতা ও খোলামেলা মন আছে। তিনি বিশ্বাস করেন,

> "আমার উপরে সত্য নির্ভর করছে, সত্যের উপরে আমি নির্ভর করছিনে- এইরকম যাদের ধারণা তাদেরই বলে গোঁড়া।"[১০]

তিনি বিশেষ একটি ধর্মীয় আচারের মধ্যে থেকে সেই সত্যকে খুঁজে চলেন এবং সত্যের খাতিরে তিনি প্রয়োজনে সেই আচারের সীমা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতেও দ্বিধা করবেন না। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে ভারতাত্মার সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের কাছে 'বিবিধের মাঝে মিলন'টুকুই ভারতবর্ষ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদটুকু নয়। উপন্যাসে নামচরিত্র গোরার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন লেখক।

সংকীর্ণ হিঁদুয়ানির বেড়া ভেঙে বৃহত্তম মানবধর্মের দিকে গোরার যে যাত্রা তা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। নিজেকে কৃষ্ণদয়ালের ঔরসজাত হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান ভেবে আসা গোরা ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজবিমুখ, স্বাধীনতাকামী। ব্রাহ্মসমাজের মাথা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় মুগ্ধ গোরা প্রথম যৌবনে ব্রাহ্ম হলেও খ্রিস্টান মিশনারিদের মুখে সনাতন হিন্দুধর্মের সমালোচনায় সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ততদিনে হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে গোরা হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছে। যে আত্মাভিমান থেকে সে প্রথম যৌবনে আবৃত্তি করত 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়' সেই আত্মাভিমান থেকেই একদা ব্রাহ্ম গোরা আজ অনুভব করল হিন্দু ধর্ম যত কলুষিত হোক না কেন তা সমালোচনার অধিকার বিদেশী শাসক ও তার অন্ধ অনুকরণকারীদের নেই কারণ তারা হিন্দু ধর্মের কেউ নয়। এই আত্মাভিমান থেকেই গোরা ক্রমশ গোঁড়া হয়ে উঠতে থাকে। তার বেশভূষা, আচার- আচরণে সে বিশেষ ভাবে ঘোষণা করতে থাকে

হিন্দু ধর্মের প্রতি তার গর্ব। তার এহেন গোঁড়ামি প্রদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি নির্ভূল বিশ্লেষণ করে বিনয়, সুচরিতা ও পরেশবাবুর কাছে-

> "তার ঐ সতর্কতাটা একটা অদ্ভুত জিনিস। তাকে যদি প্রশ্ন করা যায় সে তখনই বলে, হাঁ আমি এ সমস্তই মানি- ছুঁলে জাত যায়, খেলে পাপ হয়, এ-সমস্তই অভ্রান্ত সত্য।"[১১]

আসলে ধর্ম সংস্কারে গোরার আপত্তি নেই, তার আপত্তি অনাত্মীয়ের অনধিকারচর্চায়। সে বলে,

> "আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান। যদি বিকৃতি থাকে তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন।"[১২]

কিন্তু হিঁদুয়ানির প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়ে কেউ তার সমালোচনা করবে একথা মেনে নেওয়াও গোরার পক্ষে কষ্টকর। ভারতবর্ষের এই অসংখ্য মূঢ় হিন্দুকে ডেকে গোরা তাই বলতে চায়,

> "না তোমরা মূঢ় নও, তোমরা পৌত্তলিক নও, তোমরা জ্ঞানী, তোমরা ভক্ত।"[১৩]

ব্রাহ্ম হারানবাবুর প্রতি গোরার উপদেশ,

> "আগে আত্মীয় হবেন, তারপরে সংশোধক হবেন- নইলে আপনার মুখের ভাল কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে।"[১৪]

কিন্তু গোরার এই তত্ত্ব কথা কিন্তু তার অভিজ্ঞতার ফসল ছিল না। ধর্মের সঙ্গে সমাজের যেখানে প্রত্যক্ষ যোগ সেখানে গোরার অভিজ্ঞতা শূন্য। এখানেই গোরার স্ববিরোধিতার সূত্রপাত। 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'- এই মন্ত্র নিয়ে যখন গোরা ভারতবর্ষের সুবিশাল হিন্দু জনস্রোতের মধ্যে নেমে দাঁড়াল, সে অনুভব করল সনাতন ধর্মের যে আচারগুলিকে গোরা কলকাতায় বসে পরম শ্রদ্ধা করেছে এতদিন, তা-ই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সমাজকে নাগপাশে বেঁধেছে। তাই নন্দর মৃত্যুতে সে অনুভব করল,

> "সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ- ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই।"[১৫]

গোরা গ্রামে এসে বুঝতে পারল অভ্যাসের বশে হিন্দু ধর্মের সকল আচার- বিচার নিষ্ঠা ভরে পালন করে চললেও গ্রাম্য ভারতবর্ষের কাছে সনাতন হিন্দু ধর্ম বিশেষ কোনো মুক্তির পথ দেখায়নি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়নি, বরং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়েছে, ধর্মের খাতিরে মানবিকতাকে মানুষ বিসর্জন দিয়েছে, মানুষের একতাকে দুর্বল করে তুলেছে। তাই গোরা মুখে যতই আচার বিচারের শুদ্ধতা রক্ষা করার কথা বলুক, সে কিন্তু মানবিকতার খাতিরে মাধব চাটুজ্জের গৃহে জলগ্রহণ না করে ফিরে আসে চর ঘোষপুরে 'অনাচারী' নাপিতের গৃহে। কারাগার থেকে মুক্তির পর গোরা কলু- কৈবর্ত পাড়ায় ঘুরে ঘুরে উপলব্ধি করে সমস্ত আচার শহুরে উচ্চবর্ণ অপেক্ষাও কঠোর ভাবে মেনে চলেও এরা প্রকৃতপক্ষে আত্মহিতবোধহীন, স্বার্থপর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আচারের অস্ত্রেই মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করছে। যেমন গোরা দেখল হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বিধবা বিবাহ এই সমাজে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হলেও তাতে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য কলুষিত হচ্ছে। অর্থাৎ যাদের হিন্দু সমাজ শ্রেণি ভেদে নিম্ন বর্ণ বলে 'পশ্চাতে' রেখেছে তারাই সমগ্র সমাজকে আবার 'পশ্চাতে'র অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলেছে।

> "শিক্ষিত সমাজে যে গোরা আচারকে কোথাও শিথিল হইতে দিতে চায় না সেই গোরা এখানে আচারকে আঘাত করিল।"[১৬]

সে এটাও উপলব্ধি করল যে আচারগত শ্রেণিবিভাগকে সে এতদিন নিজ সমাজের জন্য অপরিহার্য ভেবে এসেছে তা না থাকায় মুসলমান সমাজ হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু গোরার হিন্দু কুলে জন্মের গর্বের সমস্ত ভিত্তি ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল যেদিন সে তার নিজের জন্ম রহস্য জানতে পারল। সে আনন্দময়ী ও কৃষ্ণদয়ালের পালিত এক অনাথ আইরিশ সন্তান যার রক্তের সঙ্গে এই সুবিশাল দেশের কোন আত্মীয়তাই নেই। হিন্দু ধর্ম পালনে তবে সে-ই অন্য সকলের চেয়ে বড় অনধিকারী। এই মর্মান্তিক সত্যের উদ্‌ঘাটনে এক নিমেষে গোরার সম্মুখে যেন পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল ভারতবর্ষের স্বরূপ। এতদিন গোরার নিজের সঙ্গেই নিজের একটা অদৃশ্য ব্যবধান ছিল, আজ তা অন্তর্হিত হল। আজ সে পরেশবাবুকে বলল,

> "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই... যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[১৭]

গোরাও আনন্দময়ীর মধ্যেই যেন আজ ভারতবর্ষকে মূর্ত রূপে আবিষ্কার করল। সে তাঁকে বলল,

> "তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই- শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ!"[১৮]

আনন্দময়ী যেভাবে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও গোরাকে আপন সন্তান ভিন্ন অন্য কিছু ভাবেননি, একই ভাবে ভারতবর্ষও মাতৃস্নেহে সকলকেই আপন ক্রোড়ে স্থান দেয়। সন্তানের জাত, ধর্ম দেখে না- এটাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ। উপন্যাসের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন শুদ্ধাচারী গোরা লছমিয়ার হাতে জলস্পর্শ করেনি; উপন্যাসের শেষে তার হাতেই জল পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গোরা তার নব আবিষ্কৃত ভারতমায়ের কাছে মাতৃঋণ শোধ করা শুরু করল।

দুই

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে অবিচ্ছেদ্য ভাবে রয়েছে দুটি গল্পধারা। একদিকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নিখিলেশ আদর্শ দাম্পত্য জীবনের কামনায় তার স্ত্রী বিমলাকে ঘরের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে বাইরে নিয়ে আসে যাতে বিমলা তার স্বামীকে সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রূপে চিনতে পারে এবং স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা কেবল স্ত্রীর কর্তব্যজ্ঞানে না হয়ে খাঁটি শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে। কিন্তু ঔপন্যাসিক দেখালেন স্বামীর শাসনে নিজের সতীত্ব বজায় রাখাই যে নারীর কাছে এত দিন ছিল বিবাহের অর্থ, অভাবিত মুক্তির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ঘরের বাইরে অন্তর্মুখী, স্বল্পবাক স্বামীর মনের গভীরতার তল পাওয়ার আগেই সে তার বন্ধু সন্দীপের পৌরুষ ও তেজস্বী বহিরাবরণের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিখিলেশের, স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্মিনী রূপে পাওয়ার স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়।

এই কাহিনীর প্রেক্ষাপটরূপে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে। সন্দীপের দেশভক্তির উদগ্র আস্ফালনের সামনে অন্তর্মুখী নিখিলেশের মনের অন্তঃসলিলা কল্যাণকর দেশপ্রেমের কাহিনী গড়ে তিনি উপস্থিত করেছেন একটি বিতর্ক- কোনটি দেশপ্রেম প্রদর্শনের সঠিক পথ এবং কে প্রকৃতই দেশপ্রেমিক?

উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র নিখিলেশ ও সন্দীপের দেশপ্রেমের পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। নিখিলেশ একজন জমিদার। জমিদারির উপসত্ব তার আয়ের প্রধান উৎস। অন্যদিকে তার বন্ধু সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতা। বাংলাদেশের তরুণ, আবেগপ্রবণ ছাত্রসমাজের মনে তার বিপুল প্রভাব। শুধু তাই নয়, নিখিলেশের প্রতিবেশী বেশ কিছু জমিদারও তার প্রভাবে ভেতরে ভেতরে ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কিন্তু সন্দীপের আশ্রয়দাতা নিখিলেশ স্বয়ং তার এই দেশসেবার পথের সহপথিক নয়।

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের মূলত তিনটি ধারা দেখিয়েছেন। প্রথম ধারাটি ছিল গঠনমূলক আন্দোলনের ধারা। দ্বিতীয় ধারার কর্মসূচিতে ছিল বিদেশি দ্রব্য বয়কট ইত্যাদি এবং তৃতীয় ধারাতে ছিল চরমপন্থা। এদের উদ্দেশ্য ছিল যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন।

নিখিলেশের পথ প্রথম ধারার। সে উগ্রপন্থায় নয় বরং আত্মশক্তির উদ্বোধনে বিশ্বাসী। সন্দীপের নেতৃত্বে চরমপন্থা যখন বাংলাদেশে হুজুগের আকার ধারন করেছে তখন দেশমাতৃকার বন্দনার অজুহাতে নিরীহ প্রজার উপর বয়কটের নামে এই অত্যাচার সমর্থন না করায় নিখিলেশ সন্দীপের অনুগামী ছাত্রসমাজের কাছে হুমকি পায়, প্রতিবেশী জমিদাররাও তার প্রতি বিরূপ হয় এমনকি তার কর্মচারীদের একাংশ ও স্বয়ং তার স্ত্রী বিমলাও গোপনে নিজেকে সন্দীপের আদর্শে দীক্ষিত করলেও ঔপন্যাসিকের দেশভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু নিখিলেশের কর্মকান্ডের মাধ্যমেই। নিখিলেশের গঠনমূলক স্বদেশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় বিমলার আত্মকথনেই-

> "...আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনীয় জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করছিলেন।"[১৯]

এই ভাবে খেজুর রস থেকে স্বদেশী উপায়ে চিনি প্রস্তুতি, কৃষিক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা, স্বদেশী ব্যাংক গঠন, পুরীযাত্রার জাহাজ চালানোর স্বদেশী কোম্পানী ইত্যাদি কোনো পরিকল্পনাই নিখিলেশের সফল হয়নি ঠিকই, কিন্তু ধ্বংসাত্মক পথে দেশপ্রেম তথা স্বদেশিয়ানার প্রতি তার মনোভাব ছিল কতকটা এই রকম-

বিমলা তার সমস্ত বিদেশী পোশাক পুড়িয়ে ফেলতে চাইলে নিখিলেশ তাকে বলে,

> "গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও- অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।"[২০]

এই হুজুগের যুগে বিমলার ইংরেজি শিক্ষিকা 'মিস গিলবি' যখন আক্রান্ত হলেন তখন নিখিলেশ আহত গিলবিকে নিজে গাড়িতে স্টেশনে পৌঁছে দিলে তার ইংরেজপ্রীতির যথাযোগ্য সমালোচনা হল সংবাদপত্রে, গ্রামে এমনকি বিমলার দ্বারাও কিন্তু সে বিনীত কিন্তু দৃঢ় ভাবে জানায় দেশপ্রেমের নামে নিরীহ বিদেশিকে আক্রমণ করায় দেশের কোনো উপকার নেই এমনকি সে চরমপন্থী স্বদেশীদের মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করতেও অস্বীকার করে। নিজের দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করে তার পরাধীনতা মোচনের রোমান্টিক উন্মাদনা থেকে সে অনায়াসে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে কারণ তার মতে দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি। দেশ সম্পর্কে নিখিলেশ ও সন্দীপের ধারণা তাদের তর্কের মাধ্যমেই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে যায়। সন্দীপ তথা চরমপন্থীদের 'বন্দে মাতরম' বিষয়ে বক্তব্য ছিল দেশের কাজে কল্পনাবৃত্তির একটা আবশ্যকতা আছে।

সন্দীপের মতে দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করলে যদি দেশসেবকরা উৎসাহ পায় সেই কল্পনা নির্দোষ। সে আরও বলে এই কল্পনায় দেশবাসী দেশকে যেন স্বচক্ষে দেখতে পায়। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিখিলেশ বোঝে দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করলে মাতৃশ্রদ্ধার আড়ালে দেশের ভালমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা লোপ পাবে। এছাড়াও নিখিলেশ প্রতিযুক্তি হিসেবে বলে বিদেশীদের কাছেও তাদের দেশ মাতৃসম। নিজের মাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অপরের মাকে শ্রদ্ধার কোন বিরোধ নেই। সন্দীপ আরো বলে, দেবী দুর্গা কিংবা দেবী জগদ্ধাত্রীর উদ্ভাবনের কারণ ছিল রাজনৈতিক, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বাঙালি মুসলমান শাসনের থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু এর উত্তরে নিখিলেশ জানায় সেদিন যদি বাঙালি কল্পনার দেবীদের হাতে অস্ত্র তুলে না দিয়ে নিজেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিত তাতে বাস্তবে কাজ হলেও হতে পারত। সন্দীপ হার না মেনে সগর্বে ঘোষণা করে যে দেশকে সে সত্যিই দেবতা রূপে মানে, সে নিজেকে নরনারায়ণের উপাসক বলে। তার মতে মানুষের মধ্যে যেমন দেবতার প্রকাশ তেমনই দেশের মধ্যেও কিন্তু নিখিলেশ তার যুক্তির সূত্র ধরেই বলে যে দেশকে দেবতা বলে অন্যায়কে কর্তব্য এবং অধর্মকে পূণ্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার মধ্যে সে কেবল নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করাই দেখতে পাচ্ছে। চরমপন্থীরা যদি সত্যিই দেশের মানুষের মধ্যেই নরনারায়ণের প্রকাশ দেখতে পায় তবে অপর দেশের মানুষের মধ্যেও তো নারায়ণ আছেন। সন্দীপদের যুক্তির অসারতা এখানেই ধরা পড়ে। উগ্র পথে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে দেশসেবার মধ্যে আছে একটা উন্মাদনা কিন্তু নিখিলেশের মত কতিপয় মানুষ যেমন চন্দ্রনাথবাবুরা সেদিন সাময়িক উত্তেজনায় সাড়া না দিয়ে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে স্বদেশী সমাজের শক্তিবৃদ্ধির উপায় ভেবেছিলেন- বলাই বাহুল্য লেখকের সমর্থনও তাদের দিকেই।

দ্বিতীয় ধারার স্বদেশীরা ছিলেন বয়কটপন্থী। তারা যদি কেবল নিজেরা বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও অন্যদের বয়কট করার জন্য অনুরোধের মধ্যেই তাদের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ রাখতেন তবে নিখিলেশ এতটা বিচলিত হত না, কিন্তু দেশপ্রেম যখন অন্তরের উপলব্ধির বদলে উন্মাদনা ও হুজুগের দ্বারাই পালিত হয়, তখন তা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে না। ফলে নিখিলেশের জমিদারিতেই শুকসায়রের হাট থেকে বিদেশী দ্রব্য উচ্ছেদ করার জন্য যখন সন্দীপরা প্রজাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে চাইল, নিখিলেশ স্বাভাবিক ভাবেই বাধা দেয়। গরিব গ্রামবাসীকে সস্তা বিলিতি দ্রব্য থেকে বঞ্চিত করলেও সন্দীপ তার নিজের বিলাসিতার শখ কিন্তু দমন করে না। সন্দীপ ও বিমলার আত্মকথায় বিমলা ও অমূল্যর কথোপকথনই তার সাক্ষী দেয়।

চতুর্থবার 'বিমলার আত্মকথা' অংশে বিমলার জবানিতে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন আজ যে মানুষগুলি স্বদেশীর হুজুগে মেতে উঠে অন্যের উপর বলপ্রয়োগেও দ্বিধা করছে না তারাই কিছুদিন আগে নিখিলেশের স্বদেশী পদ্ধতিতে

বিদেশী পণ্যের বিকল্প প্রস্তুতির চেষ্টাকে তাচ্ছিল্য করেছিল। আজ এরাই সন্দীপের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ভুলে ধ্বংসাত্মক খেলায় নেমে পড়েছে। তাদের এই স্বদেশপ্রীতি তো ক্ষণিকের নাহলে তারা লক্ষ্য করত নিখিলেশ অনেক অর্থের অপচয় করেও দমে যায়নি। সে কিন্তু এখনো দিশি ছুরি, পেন্সিল, বাতি, খাগড়ার কলম, পিতলের ঘটি ইত্যাদি ব্যবহার করে চলেছে। শুধু তারি নয়য়, বিমলাও উপলব্ধি করেনি যে সন্দীপের মত ওজস্বী ভাষণ না দিয়েও অন্তরে নিখিলেশ কত বড় স্বদেশী। কিন্তু এর মধ্যে কোনো জনমোহিনী চমক ছিল না, তাই বিমলা বলে,

> "... কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমার মনের মধ্যে কোনো রস পাইনি"[২১]

শুকসায়রের হাট থেকে সন্দীপের অনুগামীদের অনুরোধে বিদেশী পণ্য সরাতে রাজি না হয়ে নিখিলেশ তাদের বলে তার প্রজারা সবাই দরিদ্র। স্বদেশী দ্রব্য বাজারে অপ্রতুল এবং যাও বা পাওয়া যায় তা দুর্মূল্য, ফলে প্রজাদের সস্তা পোশাক কেনার অধিকার নিখিলেশ খর্ব করতে পারবে না। তার এই দূরদর্শিতা সেদিন তরুণ ছাত্রদলের মনে দাগ কাটতে পারেনি ফলে তাদেরই একজন নিখিলেশের দেশপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করলে নিখিলেশের শিক্ষক চন্দ্রনাথ বাবু তার হয়ে নির্ভূল যুক্তিবিন্যাস করেন-

> "দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত- মানুষই তো"[২২]

এটাই তো প্রকৃত নরনারায়ণ সেবা।

মুসলমান প্রজারা সন্দীপের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে না চাওয়ায় সন্দীপ তাদের শায়েস্তা করার জন্য হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধাতে চায়। সে অনুমান করে অন্তত স্বদেশী আন্দোলনের নামে না হোক বিধর্মীকে শাসন করার ক্ষেত্রে সে অন্তত সকল হিন্দুকে পাশে পাবে। এই উদ্দেশ্যে সে নিখিলেশেরও সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু নিখিলেশ তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় ভারতবর্ষ যদি সত্য হয় তবে মুসলমান সেই ভারতবর্ষেরই অংশ সেটা স্বীকার করে নেওয়াই উচিত।

বিমলা প্রথমবার এই মানবতাবিরোধী দেশপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করে আঠারো বছরের বালক অমূল্যর মুখে নিখিলেশের খাজাঞ্চিকে হত্যার অনায়াস উচ্চারণে। তার মনে হয় সন্দীপের কল্পিত ভারতমাতা কেন সত্যিকারের মা হয়ে উঠে এই নিষ্পাপ ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না? কিন্তু যতদিনে বিমলা এই উগ্র দেশপ্রেমের কুফল অনুমান করতে পেরেছে ততদিনে স্বদেশী উগ্রপন্থীদের প্ররোচনায় নিখিলেশের জমিদারিতে হিন্দু- মুসলিম বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। সেই বিরোধ ঠেকাতে গিয়েই কলকাতা যাবার পূর্বেই নিখিলেশ গুরুতর আহত হয় এবং অমূল্যর মৃত্যু হয়। স্বামী ও ভ্রাতৃপ্রতিম অমূল্যর এই পরিণতি বিমলার ক্ষেত্রে যেন অবশেষে মোহমুদ্গরের কাজ করে।

উপসংহারে এটুকুই বলা যায় যে স্বদেশকে না জেনে দেশপ্রেম দেখানো নিরর্থক। 'গোরা' কিংবা 'ঘরে-বাইরে' উভয় উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ তাই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের আত্মাকেই খুঁজতে চেয়েছেন এবং দুবারই আমরা দেখলাম তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে ভারতবর্ষ বহুত্ববাদের দেশ। কোন একটি ধর্ম বা সম্প্রদায় বা একটি জাতির এখানে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকতে পারে না। তাই তিনি সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানবধর্মের জয়গান গেয়েছেন, দেশ গড়তে ধ্বংসাত্মক নয় বরং গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জাতির আত্মশক্তির জাগরণের উপরেই আস্থা রেখেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, অলোক, উনিশ শতক (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ), কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৫
২. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, (তৃতীয় সংস্করণ) কলকাতা, পুস্তক বিপণি, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ১০৫

৩. তদেব, পৃ. ১১
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গোরা, (রবীন্দ্র রচনাবলী, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ৩৮
৭. তদেব, পৃ. ২৪৪
৮. তদেব, পৃ. ২৪৫
৯. তদেব, পৃ. ৪০১
১০. তদেব, পৃ. ১২৪
১১. তদেব, পৃ. ১২৪
১২. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৯৭
১৪. তদেব, পৃ. ৬৯
১৫. তদেব, পৃ. ১০৮
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫৮
১৭. তদেব, পৃ. ৫০২
১৮. তদেব, পৃ. ৫০৩
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ১৯২৬), কলকাতা, বিশ্বভারতী, মার্চ ২০১৫, পৃ. ১৮
২০. তদেব, পৃ. ১৯
২১. তদেব, পৃ. ৯৮
২২. তদেব, পৃ. ১০৫